

চলমান, অশরীরি – করোনাভাইরাস, পরিয়ায়ী শ্রমিক, ও ভারতের অর্থনীতির গভীরতর  
অসুখ

মৈত্রীশ ঘটক

জমাট রক্ত, খানকয়েক রঙটি আর কিছু রোজকার জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে রেললাইনে। তীব্র রোদে সারাদিন রেললাইন বরাবর হেঁটে পথক্লান্ত ঘর ফেরতা ষোলো জন শ্রমিক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন লাইনেই। ধরে নিয়েছিলেন, ট্রেন আসবে না। ৮-ই মে রাতে মহারাষ্ট্রের অওরঙ্গাবাদের কাছে মালগাড়ির চাকা পিষে দিল তাঁদের। পরের ছবি, ২৫শে মে। মুজক্ষরপুর রেল স্টেশনে একটি শিশু তার মাকে ঘুম থেকে ওঠাতে চাইছে। অস্বাভাবিক গরম, প্রয়োজন মত জল, খাবারের অভাব আর চরম ক্লান্তির চোটে ততক্ষণে মারা গেছেন তার মা। হাড়-হিম করে দেওয়া এই ছবিগুলো আমাদের জন-স্মৃতিতে এমনভাবেই গেঁথে গেছে, কোনও পরিসংখ্যান, তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ তার ধারেকাছে আসে না। এই লেখা লেখার সময়ে কোভিড-১৯ এর প্রকোপে মৃতের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়েছে। জুলাইয়ের গোড়া অবধি স্নেফ লকডাউনের কারণে ঘটা দুর্ঘটনা, আর্থিক বিপর্যয়, অনাহার ও দারিদ্রের কারণে মৃতের সংখ্যা নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা অনুযায়ী সেই সময়ে এই মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১,০০০ ছুঁতে চলেছিল, যখনও কোভিডের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়ায়নি।<sup>1</sup>

কোভিড-১৯ ভাইরাস যে একাধারে চলমান অশরীরি এবং অদৃশ্য আততায়ী, যার প্রকোপে সারা বিশ্ব কম্পমান, এবং সমস্ত দেশের অর্থনীতি এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অনেকাংশেই অচল, তা নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু যে পরিয়ায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা কোভিড-১৯ ভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব খুব প্রকটভাবে দৃশ্যমান করে দিল, তাঁরাই বা অন্যসময় থাকেন কোথায়? আসেন কোথা

থেকে? তাঁরা আছেন, সর্বত্র। আমরা জানি কিন্তু জানিনা, আমরা দেখি কিন্তু দেখিনা। তাঁরা প্রকৃতই অদৃশ্য মানুষ। তাঁরাও অশরীরি। তাঁরাও চলমান। কারণ, এক জায়গায় থেমে থাকলে, আটকে থাকলে, অনাহার ও মৃত্যু অনিবার্য। ধুলিধূসর পথ ধরে অবিরত এই জনস্রোত গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে শহরে এসে পৌঁছয় জীবিকা অর্জনের তাগিদে। অর্থনীতিবিদরা উৎপাদনশীল সম্পদের বন্টন (resource allocation) কথা বলে থাকেন - এ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণই শুধু নয়, শ্রম হল এমন এক সম্পদ যা নিজের ইচ্ছায় নিজের তাগিদে পায়ে হেঁটে আসে, দিবারাত অনলস পরিশ্রমে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে।

হাইরাইজ থেকে হাইওয়ে, বানান এই পরিযায়ী কর্মীবাহিনীই। তাঁরা কাজ করে চলেন নীরবে। দিনে এবং রাত্রে, কোনরকম কর্ম-নিরাপত্তা ছাড়া, সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের বাইরে, অসহনীয় দারিদ্র্য এবং অব্যবস্থার মধ্যে। তবুও বিজ্ঞাপনের বোর্ডে যে নামগুলো জ্বলজ্বল করে সেখানে কিন্তু তাঁরা কোথাও নেই, দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির এইসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ভিত্তিপ্রস্তরে তাঁদের নাম অনুপস্থিত। ডেলিভারি বয় থেকে ড্রাইভার, গৃহ-পরিচারিকা থেকে আয়া, রাস্তার সবজি বিক্রেতা বা রাস্তার ধারের খাবারের দোকান দিয়ে বসা মানুষটি, আপনার পাড়ার মুদির দোকানের মালিক - কোন পে রোল, পেনশন প্ল্যান, বা ট্যাক্স রেজিস্টারে এঁদের নাম নেই - তবুও, এঁদের সরিয়ে দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শহুরে এবং আধা শহুরে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা হয়ে পড়বে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত। যেমন এই মুহূর্তে চলছে। আপনার প্রতিদিনের জীবনে আপনি এদের প্রতিনিয়ত দেখেন। কিন্তু দেখেও দেখেননা। কারণ, এঁরা অদৃশ্য মানুষ। স্বাভাবিক সময়ে তাঁরা যে আছেন, সেটাই আমাদের মনে থাকে না। আমরা ধরে নিই আলো হাওয়া জলের মত এঁরাও আছেন, থাকবেন। আর সময় খারাপ হলে এঁরা যে চরম অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা পান তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যেমন আমরা দেখেছি এই নিদারুণ দাবদাহে ধুলিমলিন এই পরিযায়ী শ্রমিকেরা মাইলের পর মাইল হেঁটে ফিরছেন তাঁদের গৃহের উদ্দেশে। মহীনের ঘোড়াগুলির

বিখ্যাত "ঘরে ফেরার গান"-এর কথা খানিক বদলে বলা যায়, "আমি প্রায়, এখনো খুঁজি সে দেশ/জানি নেই অবশেষ/মরিচীকা হয়, স্বপ্ন দেখায়/ঘরে ফিরে আর যাওয়া যাবে নাতো/নেই পথ নেই হারিয়ে গেছে সে দেশ।" অথবা মনে পড়ে যায় উডি গাথরীরর সেই গানের লাইনগুলি – “এই দুনিয়ায় আর ঘর নাই মোর” (“I ain’t got no home in this world anymore”)। তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রেই এই কথাগুলি যেন আক্ষরিকভাবে ফলে গেছে – কেউ হয়তো মরেই গেছেন, অন্যরা গ্রামে ফিরে পেয়েছেন বিরূপ অভ্যর্থনা। এঁরা ঘর ছেড়েছিলেন দারিদ্রের ধাক্কায়, আরেকটু ভালো থাকার আর ফেলে আসা পরিবারকে আরেকটু ভালভাবে প্রতিপালন করতে পারবেন, এই আশায়। কিন্তু যখন দূঃসময় এলো, তাঁদের আপন করে নেওয়া সেই “নতুন ঘর” কিন্তু তাঁদের আপন করে নেয়নি।

গোটা দেশ যখন স্তব্ধ, নিশ্চল, আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা তখন হাঁটছেন। কিছু পাওয়ার আশায় না, বরং মরিয়া হয়ে। আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির গবেষকদের গত ১৩ই এপ্রিল থেকে বারোই মে-র মধ্যে মোট ১২টি রাজ্যের ৫,০০০ স্বনিয়োজিত, অনিয়মিত, এবং নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমজীবীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে এঁদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্মহীন হয়েছেন। যাঁরা এখনও কাজ হারাননি, তাঁদের বেতন প্রায় অর্ধেকের বেশি কমেছে। আশি শতাংশ শ্রমিক পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণে খাবার খাচ্ছেন এখন।

আবার, ওই শ্রমিকদের মধ্যে শহরাঞ্চলের দুই তৃতীয়াংশ রাজ্য অথবা কেন্দ্র সরকারের থেকে কোনও নগদ অর্থ সাহায্য পাননি। এই পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে যেতে চাইবেন – এতে আশ্চর্য কী? খুচখাচ কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, শুকনো খাবার, রুটি, বিস্কুট (একমাত্র শিল্প যেখানে বিক্রিবাটা তুঙ্গে উঠেছিল এপ্রিল, মে মাসে) নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। পরিহাসের জায়গাটা হল, সরকারের বাহারি আর্থিক প্যাকেজটি,

যা কিনা শ্রমিকদের প্রায় কোনও সাহায্যই করতে পারেনি, তার জমকালো নামটি কিন্তু শ্রমিকদের এই যাত্রার সঙ্গে খুব মিলে যায় – আত্মনির্ভর ভারত অভিযান!

পরিয়ান শব্দটির মূল কথাই হল চলনশীলতা, স্থানান্তর। অথচ, যখন পরিয়ানী শ্রমিকরা মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন চলে যাওয়ার, তখন ঘরে ফেরার জন্য কোনও রকম পরিবহন মাধ্যম পাচ্ছেন না তাঁরা। শেষমেষ ফিরতে পারছেন না তাঁদের অনেকে। যেমন ওই যোলো জন শ্রমিক। রেলগাড়ি - ঝলমলে ভারতবর্ষের প্রগতির চিহ্ন – পিষে দিল তাঁদের। যেন বিরাট প্রগতিযজ্ঞে এক আনুষ্ঠানিক বলিদান।

পরিয়ানের পেছনে থাকে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর স্বার্থে নিজের গ্রাম বা শহরের ভিটে ছেড়ে উন্নততর কোনও জীবন ও জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে পড়ার এক সিদ্ধান্ত। অর্থনীতির গুরুত্ব কাঠে তত্ত্ব বলা হয়, অর্থনৈতিক ত্রিকাকলাপ তখনই হয় যখন উৎপাদনের উপকরণগুলি অর্থাৎ ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্রে পণ্য ও সেবা উৎপাদনে অংশ নেয়। কিন্তু দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি স্থানিক চলাচল হয় শ্রম (labour) এর – উৎপাদনশীলতা কম যে বিভাগগুলিতে, যেমন কৃষিকাজ থেকে যেখানে বেশি, যেমন, কারখানানির্ভর শিল্পক্ষেত্রে, শহর-মফস্বল – সব জায়গাতেই। ভূমি স্থাবর সম্পদ, আর পুঁজি ঘাঁটি গাড়ে নগরাঞ্চলে যেখানে বাজার এবং পরিবহনের সুবিধে। শ্রম যেখানে বহুল, সেখানে শ্রম পুঁজির ডাকে আসবে, পুঁজিকে শ্রমের খোঁজে বেরোতে হয়না।

দেশের আন্দাজ পঞ্চাশ কোটির শ্রমশক্তির তিন চতুর্থাংশই স্বনিয়োজিত অথবা অনিয়মিত খুচরো শ্রমিক। তাঁদের কোনও সুনিশ্চিত আয় নেই, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নেই। ‘আদর্শ’ কর্মক্ষেত্রে যা যা সুবিধে পাওয়া যায় - স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ, বেতনসহ ছুটিছাটা, সামাজিক নিরাপত্তা – কিছুই নেই তাঁদের। পরিয়ানী শ্রমিকেরা মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ প্রায় দশ কোটি।<sup>2</sup>

দেশের শহরাঞ্চলে অনিয়মিত শ্রমিকরা মোট জনসংখ্যার ত্রিশ শতাংশ। লকডাউন চলাকালে ঘরে ফিরে যাওয়া পরিয়ায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা দেড় থেকে তিন কোটি।<sup>3</sup> এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যে কষ্টভোগ করলেন, তার মানবিক ট্রাজেডি হয়তো সবাইকে সমানভাবে স্পর্শ করবেনা। এই পরিসংখ্যান যে কতটা বিষণ্ণ হওয়ার মত, তা সকলে হয়তো সমানভাবে অনুভব করবেন না। আরো আবেগহীন, বাস্তববাদী দৃষ্টিতে দেখলে কেউ বলবেন, যে প্রথমে জনস্বাস্থ্যের সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে, তারপর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চাকা আবার চালু করতে হবে। কথাটা ঠিক। কিন্তু এই বৃদ্ধির চাকা বিষয়টা আসলে কী? আপনি মনে করতেই পারেন এ হল পুঁজি জোগাড় করা (যেমন, নতুন যন্ত্র এবং কারখানা পত্তন) এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (যেমন, উন্নততর প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে)। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কোন পুঁজিই শেষ অবধি নিজে নিজে উৎপাদন করতে পারে না – সেজন্য তার চাই শ্রমিক। ভারতের মত দেশে এই শ্রমিকদের একটা বড় অংশ আসেন পরিয়ায়ী হয়েই, গ্রাম গ্রামান্ত থেকে। কম উৎপাদনশীল কৃষিক্ষেত্র থেকে অধিক উৎপাদনশীল শিল্প ও পরিষেবার ক্ষেত্রের পরিধির প্রসার হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের প্রগতির লক্ষণ। প্রধানত এই পরিয়ায়ী শ্রমিক নামক সম্পদের চলাচলেই গড়ায় “বৃদ্ধির চাকা”। এই চলাচল বন্ধ হলে, বৃদ্ধির চাকাও থেমে যাবে, কারণ সীমিত পরিমাণ স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে হলে শ্রমিকের শ্রমমূল্য বেড়ে যাবে বহুগুণ, তাতে বিনিয়োগকারীদের পোষাবেনা।

এই পরিয়ানের পিছনে প্রধান কারণ শহরাঞ্চলে জীবনধারণের বাড়তি সুযোগ সুবিধা যা গ্রামাঞ্চলে অপ্রতুল। মজার কথা হল, পরিয়ান নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চল থেকে যত মানুষের কাজের জন্য শহরের দিকে যাবার কথা, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক কম মানুষ আসলে গ্রাম থেকে শহরে যান। এর প্রধান কারণ হিসাবে উঠে এসেছে ঝুঁকি নিতে না চাওয়ার

মানসিকতা । শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের গড় আয় কম হলেও গ্রামীণ জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজ যাপন-ভিত্তিক এবং সামাজিক সম্পর্কের জেরে গড়ে ওঠা এক স্বাভাবিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তাঁরা বাস করেন। খুব গরীব ঘরের মানুষেরা অনেক সময়েই দেশ-ঘর ছেড়ে যাবার, শহরে গিয়ে থাকার যে আনুষঙ্গিক খরচ এবং মানসিক চাপ তা বহন করতে চান না – বিদেশ-বিভূঁইয়ে গিয়ে শেষে স্বপ্ন পূরণ না হলে কী হবে এই ভয়ের বশবর্তী হয়ে। বর্তমান সঙ্কটের সময়ে পরিয়ায়ী শ্রমিকদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এই প্রবণতাকেই আরো বাড়িয়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে সম্ভবত এই পরিয়ায়ী শ্রমিকের সংখ্যা আরো কমবে।

লকডাউনপর্ব শেষ হলে এর প্রভাব কী হতে পারে? আমরা একটা বোতাম টিপব আর বৃদ্ধির চাকা আবার গড়াতে শুরু করবে, যেমনটা বেন বার্নাঙ্কে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বলেছেন মার্কিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে? বার্নাঙ্কে বলেছেন এই বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত, কারণ ১৯৩০-এর মহামন্দা বা ২০০৮-এর আর্থিক সংকটের মূলে ছিল মানুষের তৈরী প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন সমস্যা, এক্ষেত্রে সেটা সত্যি না। তাই তাঁর অনুমান, জনস্বাস্থ্যের সঙ্কট প্রশমিত হলে, যত দ্রুত অর্থনৈতিক মন্দা এসেছে, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াও সেরকমই দ্রুত হবে।

বার্নাঙ্কের অনুমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কতখানি সঠিক তা সময়ই বলবে কিন্তু একথা মোটামুটি বলাই যায় যে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে, যেখানে অসংগঠিত ক্ষেত্র অর্থনীতিতে উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী গভীর এবং ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করে থাকে সেখানে এই যুক্তি একেবারেই খাটে না। যে কোন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই বিশ্বাস এবং ভাবমূর্তির একটা বড় ভূমিকা থাকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে এগুলির ভূমিকা আরও বেশি যেহেতু এখানে কোন চুক্তি বা আইন নেই। নিয়োগ থেকে শুরু করে মাইনে, কাজের দায়িত্ব ও মূল্যায়ন

সবই মুখের কথার ভিত্তিতে হয়ে থাকে - উদাহরণস্বরূপ গৃহপরিচারকদের কথা ভাবা যেতে পারে।

সুতরাং এই ধরনের অর্থনীতিতে সামাজিক সম্পর্কের কাঠামো (social networks) এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের খুব বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সং কিনা, বা কাজে ফাঁকি দেয় কিনা, এগুলো লোকের কথা ও সুপারিশের ওপর ভিত্তি করেই হয়। কিন্তু এক ধাক্কায় অনেকে দেশে চলে গেলে, এই চ্যানেলগুলো সব ওলোটপালোট হয়ে যায়, আবার নতুন লোকের সাথে সম্পর্ক ও বিশ্বাস গড়ে উঠতে সময় লাগে। সুতরাং এদেশে অন্তত এই যে একবার সঙ্কট কেটে গেলেই আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং আবার গ্রাম থেকে শহরে যাবার পরিযায়ী শ্রমিকের ঢল নেমে আসবে, এমন ভাবনা অবাস্তব। শহরে মজুরি উল্লেখযোগ্যরকম বাড়লে এবং যে সব যোগসূত্রের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক জোগাড় করা হয়ে থাকে সেগুলিকে আবার পুনর্গঠিত করে তুলতে পারলে তবেই আবার শ্রমিকের জোগান স্বাভাবিকের দিকে এগোবে। মালিকপক্ষ অবশ্যই এই দেওয়াল লিখন পড়তে পারছেন। তারই ফল হিসাবে কিছু রাজ্যে শ্রমের আইন আলাগা করার যে চেষ্টা চলল, তার পেছনে এই দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

গরীব মানুষকে ত্রাণ দেবার সময়ে বারবার বাজারপন্থী অর্থনীতিবিদ বা ব্যবসায়ীরা যে কথাটা বলে আসেন তা হল “বিনামূল্যে” কিছু পাওয়া যায় না। সেই একই বাজারের যুক্তি কিন্তু একথাও বলে যে সম্ভায় যেমন ভালো মানের জিনিস পাওয়া যায়না, তেমন ভালো মানের শ্রমও পাওয়া যায়না। শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে আনবার একমাত্র উপায় হল কাজের পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং অধিকতর মজুরির সংস্থান – জোর জবরদস্তি নয়। ভারতের মত দেশে যেখানে প্রায় ৯০% শ্রমিকই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে এবং যাদের কোনরকম কাজের নিরাপত্তা বা অবসরকালীন সুবিধা ইত্যাদি কিছুই নেই, তাদের জন্য সরকারের দ্বারা প্রবর্তিত

সুরক্ষাবলয় যথেষ্ট শক্তিশালী হতেই হবে এই বিপর্যয় কেটে গেলে তাদের কাজে আবার ফিরিয়ে আনায় উৎসাহিত করতে। এবং এই সুরক্ষাব্যবস্থায় ন্যূনতম করণীয়ের মধ্যে পড়বে রেশন কার্ডের গতিশীলতা – অর্থাৎ দেশের যেখানেই থাক পরিয়ায়ী শ্রমিকেরা যেন সেই কার্ডের বিনিময়ে খাদ্য পেতে পারেন এবং তার মাধ্যমে গণবন্টন ব্যবস্থার অংশীদার হতে পারেন। বা, তার থেকেও ভালো যদি গণবন্টন ব্যবস্থা আবার আগের মোট সর্বজনীন করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এই সংকট যতদিন চলে, তাঁদের বর্তমান বরাদ্দের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরকমের বেশী অনুদানের ব্যবস্থাও করতে হবে (এই রিলিফ প্যাকেজে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে) – সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া এবং গণবন্টন ব্যবস্থা উভয়ের মাধ্যমে। কারণ, “বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না” – পরিয়ায়ী শ্রমিকেরা কাজে না ফিরলে দেশের অর্থনীতির চাকা গড়াবে না।

বাস্তবে অর্থনীতির ইঞ্জিন চলে পরিয়ায়ী শ্রমিকদের জ্বালানিতেই, এবং তাকে ইচ্ছে মত চালু বা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব না। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে পরিয়ায়ী শ্রমিকরা নিশ্চয়ই নিজেদের মত সিদ্ধান্ত নেবেন। অনেকে হয়তো গ্রামে সুযোগের অভাব এবং দারিদ্রের ঠেলায় আবার শহরে ফেরত যাবেন। আবার অনেকে লকডাউনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর যে শহর সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়ে তাঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেখানে সহজে ফিরে যেতে চাইবেন না। রক্তের দাগ মুছতে সময় লাগবে বৈকী।

২

পরিয়ায়ী শ্রমিকেরা আসেন মূলত গ্রাম থেকে শহরে, তাই তাঁদের সমস্যা বুঝতে গেলে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির কিছু দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা না দেখলে চলবেনা। ঘটনা হল, গত চার বছরের অর্থনৈতিক মন্দার আগে যখন সার্বিক আয়বৃদ্ধির হার মোটামুটি ভদ্রস্থ ছিল, তখনও কৃষিক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। কৃষি মজুরির বৃদ্ধির হারের



শ্লথগতি, কৃষকদের ঋণভারে বিপন্ন হওয়া সবই কৃষি অর্থনীতির রুগ্নতার লক্ষণ। আর ২০১৬ সাল থেকে সার্বিক বৃদ্ধির হারে শ্লথগতি ক্রমদৃশ্যমান। এর পেছনে অনেক দীর্ঘমেয়াদি কারণ থাকলেও, বিমুদ্রাকরণ এবং তারপর ধর-তজা-মার-পেরেক ধরণে জিএসটির প্রবর্তন যে নিম্নমুখী ধাক্কা মেরেছে, তা অনস্বীকার্য।

ভারতে অর্থনৈতিক শ্লথতা নিয়ে গত কয়েক বছরে যা কথাবার্তা হয়েছে তার বেশিরভাগটাই যোগানভিত্তিক তাত্ত্বিক কাঠামো (supply-side framework)-কে কেন্দ্রে রেখেছে। যেমন কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো, যাতে বিনিয়োগ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এখনও কোভিড-১৯ লকডাউন জনিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে মূলত যোগানভিত্তিক সমাধানের কথাই ভাবা হয়ে চলেছে। এ সত্ত্বেও অনেক কর্পোরেট সংস্থা নতুন বিনিয়োগে অনীহা দেখাচ্ছে। এই অনীহার একটা বড় কারণ হল যে উৎপাদিত পণ্যের তেমন চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তাঁদের চোখে পড়ছে না।

বিনিয়োগ কম হলেই বিকাশও থমকে যায়, শেষমেষ একটা বিষবৎ চক্রাবর্তের মত তৈরি হয় এবং বিকাশ তার যাঁতাকলে আটকে থাকে। স্থায়ী বিকাশ চাইলে এমন একটি স্বপোষণকারী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন যা অর্থনৈতিক স্ফূরণকে ক্রমাগত চালু রাখবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হোক বা নতুন বাজার তৈরি, বিকাশের যে কোনও ভরবেগকে সবসময় প্রথম থেকেই নতুন চাহিদাস্রোত তৈরি করতে হবে, তা না হলে বিকাশ ক্ষণজীবী হয়ে থেমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

চাহিদার সূত্র হিসেবে রপ্তানির সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাতে হবে, কিন্তু পাশাপাশি একটা সমান্তরাল পথ চিনে রাখাও জরুরী। হালফিলে দেশীয় চাহিদা নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, শুধু দেশীয় চাহিদার ওপর নীর্ভর করতে হলে বিকাশের প্রক্রিয়াটি ঠিক কী হবে?

কোনও কর্পোরেট সিইও বিনিয়োগ করবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত কীভাবে নেবেন? ধরা যাক হাতে নতুন বিনিয়োগ করার মত পর্যাপ্ত মূলধন আছে। তা হলেও কী তিনি উৎপাদিত পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে কি না তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইবেন না? চাহিদা না থাকলে তো উদ্বৃত্ত উৎপাদন হতে থাকবে। আবার চাহিদা যা তার থেকে বেশি আন্দাজে উৎপাদন হলে গুদামে স্টক জমবে। বর্তমানেও পরিস্থিতি কিছুটা এরকম।

২০০২ থেকে ২০১২ পর্বে ভারতীয় অর্থনীতি উচ্চ হারে যে বিকাশ দেখেছে তা কিন্তু চালিত হয়েছিল রপ্তানির দ্বারা, বিশেষত সফটওয়্যার সার্ভিসেস-এর ক্ষেত্রে। শতাব্দীর শুরুর সে পর্বে দুনিয়া জুড়ে সফটওয়্যার সার্ভিসেস এর চাহিদা তুমুল বৃদ্ধি পায় এবং সেই সময়েই ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমশক্তির একটা স্ফূরণ ঘটে। সফটওয়্যার সার্ভিসেস ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের আয়ের

হার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে ভোজ্য হিসেবেও তাঁরা উপভোগ হার অনেকটা বাড়িয়ে দেন। বাড়ি, গাড়ি, রেস্টোরাঁ কিনতে শুরু করেন তাঁরা, ফলে নির্মাণশিল্পের ক্ষেত্রগুলিতে চাকরির পদ তৈরি হতে থাকে। এ সবেের কারণে অর্থব্যবস্থার বাকি দিকগুলিতে আবার একটা বাড়তি প্রভাব পড়ে। নির্মাণ শিল্পের কয়েকটি ক্ষেত্র, যেমন ঔষধ প্রস্তুতকারক অথবা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির ক্ষেত্রগুলিও একটা রপ্তানির বাজার পেয়ে যায়, এবং এরও প্রভাব যুক্ত হয় দেশের অর্থনীতিতে। তবে এই সব রপ্তানি ক্ষেত্র থেকে সরাসরি উপার্জন করলেন যাঁরা, দেশের পুরো শ্রমশক্তির নিরিখে তাঁরা কিন্তু অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ।

করোনাভাইরাসজাত সঙ্কটকে দূরে রেখে যদি দীর্ঘসূত্রী দৃষ্টিতে আমরা বিষয়টা দেখি, প্রথমেই বলতে হবে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফটওয়্যার সার্ভিসেস এর সেই তুমুল চাহিদা আজ আর আগের মত জোরালো না। এখন ভারতীয় অর্থনীতি আবার একটা তেমন চাহিদার জোয়ারের অপেক্ষায় বসে। কোথেকে তা আসবে? বর্তমান আর্থিক শ্লথতা করোনাভাইরাস আসার আগে থেকেই চলছে এবং তা সফটওয়্যার বাজারে ভারতের চাহিদা কম হয়ে যাওয়ার এক অনিবার্য পরিণতিও বটে। ভারতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তপোক্ত দেখালেও জিডিপি ক্রমশ পড়তেই থাকবে। আসলে ওই ধরনের বিকাশ পর্ব সবসময়েই নিজের তুঙ্গ অবস্থা বেশিদিন ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং নতুন কোনও চাহিদা তৈরি না হলে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে।

একটা সামগ্রিক চাহিদা তৈরি করতে গেলে দেশের মধ্যেই স্বয়ংনির্ভর একটা চাহিদা তৈরি করতে হবে। এখন, ভারতবর্ষে তা আদৌ কতটা সম্ভব?

ভারতবর্ষের মোট শ্রমশক্তির ৮৫% অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন। এই ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে ছোট ছোট ব্যবসা, পরিষেবা ও দোকানপাট দিয়ে, বাজার যাবার পথে রাস্তার দুপাশে আপনি এদের দেখতে পাবেন। এদের বৃদ্ধির বা সমৃদ্ধির পথ খুবই সীমিত। এদিকে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫০% আসে এখান থেকেই। ভাবুন - তার মানে সংগঠিত ক্ষেত্রে দেশের মোট শ্রমশক্তির ১৫% কাজ করলেও, মোট জাতীয় আয়ের বাকি ৫০% আসে সেখান থেকে - উৎপাদনশীলতার এবং সমৃদ্ধির তফাৎ এখন থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের বাস গ্রামে। যায়বিন্যাসে যারা দেশের দরিদ্রতম ২০%, তাদের প্রায় ৯০% থাকেন গ্রামাঞ্চলেই। গ্রামীণ ভারতের মোট আয়ের ৩৯% কৃষি থেকে আসে এবং বাকি ক্ষেত্রগুলির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার অনেকাংশে কৃষির লাভ-লোকসানের ওপর নির্ভরশীল। যখন কৃষক কিছুটা লাভের মুখ দেখেন, তখন তাঁরা একদিকে যেমন স্থানীয় স্তরে পণ্য কেনাকাটি করেন, তেমনি শহরাঞ্চলের বসতিবাজার থেকেও পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হন। ভারতীয় কৃষির নিম্নগামী উৎপাদনশীলতা, চাষের জন্য গলদ-ফসলি,

দুর্বল গ্রামীণ পরিকাঠামো, বাজারের সঙ্গে সংযোগহীনতা – এ সব বিষয় মাথায় রাখলে স্পষ্ট, কৃষিক্ষেত্রে কিছু সত্যিকারের কাজ করার সুযোগ ও প্রয়োজন দুইই চোখের সামনে মজুত।

এখানে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে গ্রামীণ আয় বাড়ানোর বিষয়টা। শুধু যান্ত্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির কথাই ভেবে গেলে চলবে না। কৃষিজাত পণ্যের মিশ্রণ এবং কৃষিপদ্ধতিতে আশু পরিবর্তন না করে শুধুই ফলন বাড়ানোর প্রচেষ্টা করে গেলে দাম পড়ে যাবে এবং গরীব কৃষকের দারিদ্র আরও জেঁকে বসবে। মিশ্র কৃষির দিকে কিছু বদল এনে শহর এলাকায় গ্রামীণ পণ্যের চাহিদা তৈরি করা গেলে কৃষক আয়ের মুখ দেখবেন। শস্যের পাশাপাশি উদ্যানপালন (ফুল, ফল), দুগ্ধজ শিল্প, পোলট্রি, কৃষিজ পণ্যভিত্তিক সুরা (যেমন, ওয়াইন) ইত্যাদি আয় বাড়াবে।

অর্থনীতিবিদরা কৃষি থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির যোগানের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেন তা যথার্থ। এর ফলে গরীব লোকের কিছুটা আয়ের সুরাহা হয়। কিন্তু, অর্থনীতিবিদরা মাঝেমাঝেই খেয়াল রাখেন না যে চাষবাসের ক্ষেত্রের মধ্যেও একটা অবস্থান্তর হতে পারে, বিশেষত কম আয়ক্ষেত্রগুলিতে। যথা – মূলত শস্যনির্ভর চাষআবাদের সঙ্গে ফল, সবজি, দুধ, ডিম, মাংস, মাছ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চাষের দিকে যাওয়া। লক্ষ লক্ষ কম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকরা যেখানে দানাশস্য চাষে আটকে থাকেন, এই বহুবিধ দিকগুলো তাঁদের সামনে আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ উপস্থাপিত করতে পারে। তাতে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা এবং চাহিদা বাড়বে বই কমবে না।

তবে এই বিবিধকরণের জন্য যথেষ্ট গবেষণা ও প্রচার দরকার। গ্রামীণ পরিকাঠামো, হিমঘর, ঋণ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি নানারকম সহযোগীতা দরকার যাতে বাজার প্রশস্ত হয়। এর ফলে স্থানীয় পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে শহরের পণ্যেরও একটা গ্রামীণ চাহিদা বাড়বে, এবং একটা প্রাণবন্ত লেনদেনের চক্র তৈরি হবে – শহরের বর্দ্ধিত আয় একদিকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চালু রাখবে এবং গ্রামীণ বর্ধনশীল আয় তেমনি শহরের পণ্যের চাহিদাকেও ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। এই ব্যবস্থার স্বাস্থ্যকর অভিঘাতে বিকাশ স্থায়ী হবে।

যেহেতু অর্থনীতির জাগরণের ক্ষেত্রে জনমানস খুব বড় একটা উপাদান, তাই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সারা দেশ আজ যে হতাশায় আচ্ছন্ন, তা কি এই গ্রামীণ বিকাশ নীতি দূর করতে পারবে? আমরা ভরসা করে উত্তর দিতে পারি, হ্যাঁ পারবে।

ইদানীংকালে নিয়মিত কর্মসংস্থানগুলি কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমজোগানকে খুব একটা জায়গা দিতে পারছে না। এর ফলে জনপ্রতি আয় কমে যাওয়ার পাশাপাশি একটা হতাশাগ্রস্ত, ঝিমিয়ে পড়া, অপরাধপ্রবণ যুব সমাজ তৈরি হচ্ছে। কোনও দেশ কিন্তু জনসংখ্যার সদ্ব্যবহারের এমন

সুযোগ চট করে পায় না। ভারত তার সূবর্ণ সুযোগ হারিয়ে ফেলতে বসেছে। যদি গ্রামীণ অর্থনীতি মাথাচাড়া দিতে থাকে, তাহলে উৎপাদন ক্ষেত্রে, নির্মাণ শিল্পে স্থানীয় চাকরি তো তৈরি হবেই, পাশাপাশি গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি পেলে শহরের নিয়মিত সংস্থানগুলিও বিনিয়োগ ও কর্মী নিয়োগ ইত্যাদি শুরু করবে। এইরকম একটা প্রক্রিয়া শুরু হলে গ্রাহক থেকে বিক্রেতা - সকলেই মানসিকভাবে চাঙ্গা হবে।

মোদা কথা হল এই - গ্রামীণ অর্থনীতিভিত্তিক বিকাশের এই নীতি তিনটে ভিন্ন অর্থ সংযুক্ত ভাবনাবিন্দুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা ভাবনাবিন্দুই একটা স্তিমিত সার্বিক চাহিদার (aggregate demand) পরিবেশকে মাথায় রাখে।

প্রথমত, স্বনির্ভর আয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি জনসংখ্যার দরিদ্রতর অংশের কাছে পৌঁছলে সার্বিক চাহিদার ক্ষেত্রে তা একটা জোয়ার আনবে, কারণ গরিব মানুষ তাঁর এই বর্ধিত আয়ের একটা বড় অংশ খরচ করতে চাইবেন।

দ্বিতীয়ত, গরিব মানুষ তাঁর এই বর্ধিত আয় খরচ করতে চাইবেন সেইসব পণ্যের জন্যে যা স্বল্প প্রশিক্ষিত শ্রমিকের তৈরি। এর একটা ফলপ্রসূ দিক আছে সার্বিক চাহিদা বাড়াতে।

তৃতীয়ত, নীতিগত যে সমাধানসূত্র আমরা ভাবতে চাইছি তা গ্রামীণ ও শহরের চাহিদার মধ্যে একটা পরিপূরক আবর্তন তৈরি করবে, যার ফলে বিকাশ যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হবে। যখন নীতিগত হস্তক্ষেপে গ্রামীণ মিশ্র কৃষিতে বদল আসবে, গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা শহরের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করবে। শহরে চাহিদার বৃদ্ধির অনুপাতে গ্রামীণ উৎপাদক সংখ্যাও বাড়বে। শহরের গ্রাহকদের তুলনায় গ্রামের জনসংখ্যার, বিশেষত কম আয়ের মানুষজন তাদের বর্ধিত আয়ের একটা বড় অংশ শহরে উৎপাদিত পণ্য কিনতে ব্যয় করেন। তাই এই নীতির ফলে বর্ধিত আয়ের ফলে শহরে উৎপাদিত পণ্যেরও একটা চাহিদা তৈরি হবে যার ফলে শহরে আয়ও একইসঙ্গে বৃদ্ধি পাবে।

এই ওপরের প্রস্তাবগুলির একটিও কিন্তু এই দাবী করে না যে রপ্তানিভিত্তিক আয়ের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। বাজার সংস্কারের মত চালু প্রস্তাবগুলো এখনও যথেষ্ট বৈধ। তা সত্ত্বেও, গ্রামীণ উন্নয়ন এতদিন যথেষ্ট অবহেলিত হয়ে এসেছে, এবং পুনর্বিবেচনা খুবই জরুরী। এতে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির প্রক্রিয়াকে খানিকটা অক্সিজেন জোগাবে এই প্রস্তাবগুলি।

তবু, এও অনস্বীকার্য যে দ্রুত বিকাশের হার (মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সরিয়ে রেখে প্রায় ৫% জনপ্রতি আয়ের বৃদ্ধির হার) যাদের, সেই পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলি অনেকদিন ধরে

রপ্তানিনির্ভর বিকাশের নীতি লাগু করে রেখেছে। দেশীয় চাহিদার ওপর নির্ভরশীল গ্রামীণ নেতৃত্বে বিকাশ হয়ত এত উঁচু হার দেবে না। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে লাভদায়ক দ্রুত বিকাশের থেকে দীর্ঘস্থায়ী এবং জনসংখ্যার নীচের স্তর পর্যন্ত উপকৃত হবে এমন ধীরগতির বিকাশ অধিক কাম্য।

৩

শেষ করি কোভিড-১৯ এবং তার অর্থনৈতিক প্রভাব আমাদের প্রচলিত অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার কাঠামো নিয়ে যে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে, তা নিয়ে কিছু আলোচনা করে।

কোভিড-১৯ প্রথমত এবং প্রধানত একটা জনস্বাস্থ্যের সঙ্কট। তবে এর সঙ্গে সঙ্গেই আসে এক অর্থনৈতিক সঙ্কটও, যা কোনও অংশে কম ধ্বংসাত্মক নয়। বিশেষ করে ভারতের মত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং জনস্বাস্থ্যের সঙ্কট – দুই-ই নিবিড়ভাবে পরস্পর সংলগ্ন। সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে, ভারতের যা জনসংখ্যা তার নিরিখে দ্বারা সেই সঙ্কট প্রতিরোধ করার মত যথেষ্ট সংস্থান ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাতে নেই, তা প্রথম থেকেই আশংকা ছিল, আর এখন সংক্রমণের ক্রমবর্ধমান হারের থেকে তা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

একই সঙ্গে, জনঘনত্ব এবং দারিদ্রের কারণে লকডাউন বা সামাজিক দূরত্ব লাঘু করা মুশকিল। এ দিক থেকেও ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের মুখে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা এসে পড়ে। পাশাপাশি, ব্যক্তির নিরিখে দেখা যাবে দারিদ্র এবং ব্যাধি পাকেচক্রে একে অপরকে আরও জেঁকে বসতে সাহায্য করে: গরীব মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ আর্থিক সামর্থ্য কম হওয়ায় একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের পক্ষে যথোপযুক্ত নিরাপদ নিভৃত্যাপন, যথাযথ চিকিৎসা লাভের খরচ বহন করার সুযোগও কম।

কোভিড সঙ্কট এবং লকডাউন দুয়ের তাৎক্ষণিক ধাক্কা সামাতে ব্যস্ত ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সামনে মূল অর্থনৈতিক দ্বিমাত্রিক। প্রথমত, স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সচল রাখা, অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান বজায় রাখা যাতে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনটুকু পূরণ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, দেশের সেই ৯০ শতাংশ জনগন, যাঁরা বিত্তবান নন বা যাঁদের সুদৃঢ় কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা নেই, সেই তাঁরা যেন আচমকা আর্থিক চাপের মুখে ভেঙে না পড়েন তা নজরে রাখা। এখন প্রশ্ন হল, এই দুই লক্ষ্য একসঙ্গে পূরণের রাস্তা খুঁজতে গিয়ে বর্তমান সঙ্কট থেকে শেখার মত কী কী পাওয়া যেতে পারে?

একটু পিছিয়ে গিয়ে যদি দেখা যায়, এই সঙ্কট মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় দুটি হাতিয়ার হতে পারত জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বেশি করে বিনিয়োগ এবং একটা শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা জাল তৈরি রাখা। পশ্চিমে সরকারের তরফে কুচ্ছসাধন বা কঠোর ব্যয়সংকোচ নীতির (fiscal austerity) সমর্থক এবং ভারতে সংস্কারওয়ালাদের এই রকম একটা বিশ্বাস আছে যে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি মানেই অপচয়। এই রকম ধারণার কারণে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই দুটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হয়ে এসেছে।

যুক্তরাজ্য তথা পশ্চিম ইউরোপে কল্যাণকামী রাষ্ট্র এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর। একই ভাবে আশা করাই যায়, কোভিড-১৯ পরবর্তী ভারতে বা পৃথিবীর অন্য দেশগুলিতেও জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা জাল তৈরির পেছনে বিনিয়োগ যে আদৌ অপচয় নয়, বরং জাতীয় সুরক্ষা বা অন্যান্য নীতির মতই গুরুত্বপূর্ণ –এই রকম একটা বোধোদয় ঘটবে।

এই ব্যাধির সূচনা কী ভাবে হয়েছে তা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। তবে যা জানা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে অন্তত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা চাহিদায় মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য, তা স্পষ্টতই যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় বা দূষণই যে শুধু সম্ভাব্য সমস্যা নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানবসমাজের ভারসাম্য বিপন্ন হলে মানবসমাজের অস্তিত্বই যে সঙ্কটে পড়তে পারে, এই বিপর্যয় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল। যাঁরা পরিবেশ-সচেতনতাকে ভাবুকদের বিলাস ভাবেন, আশা করি কথাটা তাঁরাও উপলব্ধি করবেন।

আর একটা শিক্ষা হল এই যে বিশ্বায়নের রথের চাকা আপাতত স্থির হলেও, বিশ্বায়ন চাই বা না চাই, কোনও এক দেশে উদ্ভূত স্বাস্থ্যসমস্যা দাবানলের মতো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে অপারিসীম ক্ষতি করতে পারে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই কোনও দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধি ও আচার, শুধু তাদের নিজস্ব সার্বভৌম ব্যাপার নয়। তা সম্পর্কে বিশ্বজোড়া সাধারণ বিধিনিষেধের প্রয়োগ ও সহযোগিতা অতি-আবশ্যিক। দুর্ঘটনা হলে যেমন গাড়ি বা রাস্তা বাতিল না করে আমাদের নিজেদের সতর্কতা, রাস্তা ও গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ আর ট্রাফিকের নিয়মকানুন ও তার প্রয়োগ নিয়ে ভাবতে হয়, সমস্যা বিশ্বায়ন নিয়ে নয়, কোন নিয়মকানুনের কাঠামোয় তা হচ্ছে, সমস্যা সেখানে।

জাতীয় স্তরে দেখলে, পরিযায়ী শ্রমিকদের করুণ অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত বা ফটকবদ্ধ আবাসন-ভিত্তিক মডেলের

(gated-community model) অদূরদর্শী ও অপরিণামদর্শী দিকটি। শহুরে বিত্তবান শ্রেণির বিলাসব্যসন এই গরীব শ্রমিকদেরই শ্রমজাত, যাঁরা সামান্য টাকার আশায় নিজেদের ভিটে ছাড়েন। কোনও রকম নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ছাড়াই এইরকম বড় বড় বিপর্যয়ের সঙ্গে যুঝতে হয় তাঁদের।

এই সবকিছুর ফলে যে ভারতবর্ষে অর্থনীতির স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এ দুয়ের সামনে যে কত বড় সঙ্কট তৈরি হয়েছে, তা বুঝতে খুব বোদ্ধা হওয়ার দরকার পড়ে না। স্পষ্টতই আমাদের একটা সুরক্ষা জাল দরকার, বিশেষত তাঁদের জন্য, যাঁরা ফরমায়েশি বা খেপ অর্থনীতির (gig economy) মধ্যে কাজ করেন। তাঁদের কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তার দিকটি বিবেচনা করলে, মানবিক কারণে তো বটেই, বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিতেও একটা সর্বজনীন ন্যূনতম আয় (universal basic income) চালু করার পক্ষে সওয়াল জোরদার হয়।

আমাদের নিজেদের জীবন থেকে সবচেয়ে বড় উপলব্ধি হল: আমরা, যাঁরা সম্পদের নিরিখে দরিদ্র নই, তাঁদের বিলাসব্যসনের অতিরেকগুলি কিঞ্চিৎ কম করেও দিব্যি কাজ চালাতে পারি। এই অতিরিক্ত অপচয়ের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাঁড়ারে তো টান পড়ছেই, উপরন্তু, নাগরিকদের করপুষ্ট জনস্বার্থে ব্যবহার্য সম্পদ, যা ব্যবহার করা যেতে পারত জনস্বাস্থ্য সহ অন্যান্য জরুরি পরিষেবার বিভাগগুলিতে, তা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কুক্ষিগত হয়ে থেকে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা আবার শিখলাম, এই পরম দুর্যোগক্ষেণে রাষ্ট্রশক্তির বজ্রমুষ্টি বা বাজারি অর্থনীতির অদৃশ্য হাতের ওপর যখন ভরসা রাখা যায় না, সব কিছু যখন বিপন্ন, তখন আমাদের হাতে যা বাকি থেকে যায়, তা হল সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিরাপত্তাজাল। তার মধ্যে আছে পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী, ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে এই সম্পর্কগুলি মোটেই কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়, টিকিয়ে রাখতে হয়। অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থের, ব্যক্তিগত আর্থিক উচ্চাশার কোনও জায়গা নেই এখানে।

একটু প্রসারিত অর্থে ভাবলে, এই সঙ্কট আমাদের এ কথা ভাবতে আহ্বান জানাচ্ছে যে অর্থব্যবস্থা বিষয়টা আসলে ঠিক কী, এবং আমরা তার থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করি। অর্থব্যবস্থা কি একটা যন্ত্র যা যা কেবল পণ্যভোক্তাদের ক্ষুধা মেটাবে, আর মুনাফার অঙ্ক বাড়ানোর কাজ করবে, নাকি তা এমন এক বাস্তবতন্ত্র যেখানে আমরা সকলে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটা জটিল অন্তর্জালে পরস্পর সংলগ্নতায় বেঁচে আছি? যদি দ্বিতীয়টাই সত্যি হয়, তাহলে কি মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণই কি আমাদের বাঁচার পথ না?

বর্তমান সঙ্কট আবার বুঝিয়ে দিল যে অবিরাম প্রগতির অতি-আকাজ্জা একটা স্পষ্ট বিপর্যয়কে ডেকে আনে – অনেকটা ফলের লোভে শিকড়শুদ্ধ গাছ উপরে নেওয়ার মত। ‘মানুষের আগে

মুনাফা’ – এইরকম ভাবনার সঙ্গেসঙ্গেই একটা সতর্কীকরণও আসে: মানুষ না থাকলে মুনাফাও থাকবে না। আশা করি, করোনাপূর্ব যুগের ‘ব্যক্তিস্বার্থ আগে, জনস্বার্থ পরে’ নীতিটি অন্তত এবার পরিত্যক্ত হবে। তার জায়গায় করোনা পরবর্তী যুগে আসবে ‘আগে জনস্বার্থ, তারপর ব্যক্তিস্বার্থ’ – এই স্লোগান।

*কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সৌরভ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রতিশব্দজন্ম গোষ্ঠীর বন্ধুরা।*

---

<sup>1</sup> সূত্র : The Wire, September 16, 2020 (<https://thewire.in/labour/migrant-labourers-data-deaths-numbers>), India Today, September 16, 2020 (<https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/migrant-workers-deaths-govt-says-it-has-no-data-but-didn-t-people-die-here-is-a-list-1722087-2020-09-16>)

<sup>2</sup> সূত্র : “Indian migrants, across India”, by Sushant Singh and Aanchal Magazine, *Indian Express*, April 29, 2020.

<sup>3</sup> সূত্র : “How many migrant workers displaced? A range of estimates”, Seema Chishti, *Indian Express*, June 8, 2020.